Vol. 40 | No. 2 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

স্পৃশ্য অস্পৃশ্য : হিন্দি সাহিত্য ও ‘রঙরেজিনী' কবিতার কাহিনী-উৎস

Volume	40
Issue	2
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আমীনুর রহমান
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i2.5
Pages	61-86
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য : হিন্দি সাহিত্য ও 'রঙরেজিনী' কবিতার কাহিনী-উৎস

আমীনুর রহমান

এ প্রবন্ধে মূলত প্রায়-বিচ্ছিন্ন তিনটি চিন্তাকে একটি কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। চিন্তাগুলো বিচ্ছিন্ন কিন্তু সম্পর্কহীন নয় বলেই এ-প্রচেষ্টা। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের উপান্ত্যে রচিত গদ্যছন্দের কবিতাবলিতে কেন কাহিনীর প্রভূত ব্যবহার করেছেন তার কার্যকারণ নির্ণয় করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, *পুনশ্চ*-এর ছ'টি কবিতাকে নির্বাচন করা হয়েছে যাদের কাব্য-বক্তব্যে রয়েছে 'স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য' বিষয়ে রবীন্দ্র-মানসিকতার পরিচয়। ঐ কবিতা ছ'টির মধ্যে পাঁচটির ('রঙরেজিনী' ব্যতীত) কাহিনী-উৎসে যে মধ্যযুগের হিন্দি সাহিত্যের সন্ত কবিদের, যাঁরা জীবনে ও দর্শনে ছিলেন সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন মানবিকতাবাদী, জীবন-বৃত্তের প্রেরণা রয়েছে তা বিবৃত হয়েছে। তৃতীয়ত, মধ্যযুগের হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম কবি আলম-এর জীবনেতিহাসকে অবলম্বন করেই যে রবীন্দ্রনাথ *রঙরেজিনী* কবিতাটি রচনা করেছেন তা নির্ণিত হয়েছে। বস্তুত, গদ্যের প্রাত্যহিকতা ও রূঢ়তাকে কাব্যময় করে তোলার জন্যই রবীন্দ্রনাথ কবিতায় কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন; কাহিনী অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি সংলগ্ন হয়েছেন মধ্যযুগের সন্ত হিন্দি-কবিদের জীবন-দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি এবং আহরণ করেছেন 'রঙরেজিনী' কবিতার কাহিনী-উৎস।

পুনশ্চ[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) কাব্যভুবনে 'গোধূলি পর্যায়ে'[২]র অনন্যসাধারণ সংযোজন। সাধারণভাবে এ-কাব্যগ্রন্থটির অনন্যতা চিহ্নিত হয় অনুভূতির বাহন হিসেবে গদ্যছন্দের প্রবর্তনার কারণে।[৩] তবে এর বিষয়বস্তুর, রবীন্দ্রকাব্যের পূর্বাপর বিষয় বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে, অভিনবতার কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[৪] সমগ্র *পুনশ্চ*-এর কবিতাগুলোকে মোটাদাগে বিভাজন করলে দেখা যাবে তার একদিকে অবস্থিতি পেয়েছে ক্ষুদ্র, কখনো তীব্র নাটকীয় কাহিনী বিজড়িত কবিতাবলি আর অন্যদিকে প্রভূত দৃশ্যচিত্র সম্বলিত কবিতামালা। কাহিনীমূলক কবিতাগুলোর ঋজুতা ও প্রাণময়তা বিনির্মিত এর নাটকীয়তায়, অভিনবতায় ও পরিণামী বক্তব্যের (message) মাধ্যমে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ *পুনশ্চ*-এ তাঁর পূর্বাচরিত ও স্বচ্ছন্দ কাব্য-জগৎকে অতিক্রম করে এসেছেন নতুন আলোর ভুবনে— আঙ্গিকের দিকে যেমন তেমনি বিষয়ের দিকেও।

পুনশ্চ-এর পরিবর্তমান পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের প্রাতিবেশিক পরিমণ্ডলও। পরিবর্তিত প্রতিবেশ থেকেই হয়তো তিনি লাভ করেছিলেন গদ্যের প্রবর্ধিত সীমানার অনুভব, যার বাহনে কাব্যও হয়ে ওঠে লীলাচপল। এখন আর যৌবনের দিনানুদিনের পরিচিত পদ্মার লীলাতরঙ্গিত রূপ-নেশা নেই তাঁর চোখে: তিনি এখন তরুবিরল মাঠের প্রান্তের ছায়াবৃত্ত সাঁওতাল পাড়ার বাসিন্দা। ঘর থেকে দূরে তাকালে মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে মহিষাসুরের মুণ্ডের মত মরচে ধরা কালো মাটি : আর তাঁর প্রতিবেশী ছিপছিপে দেহের কোপাই-নদী; জাতিতে অনার্য, প্রাচীন গোত্রের গরিমাবিহীন। গ্রামের সঙ্গে কোপাইয়ের গলাগলি—পারের সঙ্গেও বিরোধ নেই। তার ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা, প্রাকৃতজনের ভাষা; সে ধনে উন্মত্ত নয়- দৈন্যে নয় মলিন। এই গৃহী ও গৃহস্থ, নির্বিরোধ ও সাধারণ নদীই হয়ে উঠল কবির সঙ্গী :

'কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে ;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা;
আর মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।'[৫]

পুনশ্চ-এ আহৃত হল গদ্যের ঋজু ভঙ্গির কাব্যময় প্রকাশ—কবিতায় 'আবেগের বেগ' গেল কমে, ছন্দের 'অতিনিরূপিত বন্ধনে' কবিতাকে বেঁধে না রেখে প্রকাশ রীতির সলজ্জ অবগুণ্ঠনকে দূর করে গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে কবিতার সঞ্চরণকে স্বাভাবিক করে তুললেন কবি। আর কবিতায় অসংকুচিত গদ্যরীতি কাব্যের অধিকারকে বাড়িয়ে দিল।[৬] গদ্যরীতিতে কাব্যের এ-অধিকার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বললেন : *কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি তা হলে সাহিত্য সংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হাল্কা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা জায়গা পায়—কাব্য জোরে পা ফেলে*

চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময় যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচু-নিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর; সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।[৭] কিন্তু গদ্যের পথ মসৃণ-কাব্যময় নয়। তাতে উচ্চাবচতা আছে : গদ্য ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা জড়িয়ে সুরে-বেসুরে ঝনঝন ঝঙ্কার লাগিয়ে দেয়। গর্জনে ও গানে তাণ্ডবে ও তরল তালে মুখরিত হয় গদ্যবাণীর মহাদেশ। কখনো সে অগ্নিনিশ্বাস, কখনো জলপ্রপাত, কোথাও সমতল কোথায় অসমতল, কোথাও দুর্গম অরণ্য ও কোথাও মরুভূমি তার।[৮] তাই কাব্য রসের আস্বাদ গদ্যভঙ্গির উচ্চাবচতায় শুষ্ক হয়ে উঠতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ নতুনতর কবিতায় 'গতি ও অবগতি'র জন্যই কাহিনীর সমাবেশ ঘটালেন : যা পূর্ণ করলো বিমূর্ত আবেগের অনুপিস্থিতি ও হ্রাস করলো গদ্যের উচ্চাবচ প্রাত্যহিক রূঢ়তা।

রবীন্দ্র-কবিতায় কাহিনীর প্রভূত সন্নিবেশ ঘটেছিল পূর্বেই, *কথা ও কাহিনী* (১৯০৮) -তে : কিন্তু সে-কাহিনীর একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল দূরবর্তী ঐতিহ্যের পুনরুল্লেখ, যার উদ্দেশ্য পাঠকের স্মৃতিচিত্তকে পুনর্জাত করা; অন্যদিকে *পুনশ্চ*-এর কাহিনীতে পাওয়া গেল দিনানুদৈনিকতা, সাধারণ মানুষের বেদনাবিভব; যাদের মধ্যে মাসিক তিন টাকা মাইনের ছেঁড়া ছাতা মাথায় দেয়া গুরুমশায় থেকে শুরু করে শালিক, পিঁপড়ে, মরা বেড়ালের ছানা, কাঁঠালের ভূঁতি ও গুবরে পোকা পর্যন্ত ঠাসাঠাসি করে এক মহলায় আশ্রয় গ্রহণ করল।

দুই

পরিশেষ থেকে যে তেরটি কবিতা নিয়ে *পুনশ্চ*-এর দ্বিতীয় ও প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যকার ছ'টি কবিতা *পুনশ্চ*-এর অন্যান্য কাহিনীমূলক কবিতা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির । কবিতা ছ'টি হচ্ছে: 'শুচি', 'রঙরেজিনী', 'মুক্তি', 'প্রেমের সোনা,' 'স্নান সমাপন', ও 'প্রথম পূজা'। কবিতাগুলোকে গ্রন্থের ক্রম পরিহার করে রচনাক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করলে তা হবে এমন : 'প্রথম পূজা' (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯); 'শুচি' (১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯); 'রঙরেজিনী' (২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯); 'প্রেমের সোনা' (২৪ পৌষ ১৩৩৯); মুক্তি (১৪ মাঘ ১৩৩৯); 'স্নান সমাপন' (১৫ ফাল্গুন ১৩৩৯)। রচনা-তারিখ অনুযায়ী কবিতাগুলো এভাবে পুনর্বিন্যাস্ত করার উদ্দেশ্য, কবিতাগুচ্ছের কাহিনীক্রমের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-মানসিকতার একটি বিশেষ প্রবণতার পরিচয় লাভ করা। সে-প্রবণতাকে নির্দেশের লক্ষ্যে নিম্নে কবিতা ছ'টির কাহিনীক্রম সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপ- হ-

ক. প্রথম পূজা

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির। গড়েছিলেন কিরাত জাতের লোকেরা—কিন্তু কিরাতেরা আজ অস্পৃশ্য বলে মন্দিরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ব্যথাতুর মনে তারা দূর থেকে মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম জানায়। একদিন হঠাৎ, মন্দিরের বাইরের প্রাচীর ভেঙে পড়ে। রাজা নির্দেশ দিলেন সংস্কারের কিন্তু কিরাত ব্যতীত পাথরের কাজে অন্যেরা তেমন দক্ষ নয়; তারাই জানে কি করে পাথরের ওপর পাথর বাঁধে, কি করে পিতলের ওপর রুপোর ফুল তোলা যায়—কৃষ্ণ শিলায় মূর্তি গড়বার ছন্দ কেবল তাদেরই অধিগত। নিরুপায় রাজা অস্পৃশ্য কিরাত জাতির সর্দার মাধবকে ডেকে বললেন, 'তোমরা না হলে দেবালয়-সংস্কার হয় না।' 'আমাদের' 'পরে দেবতার এই কৃপা।'– রাজার প্রস্তাবের উত্তরে এ-কথা বলে মাধব দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালো। নৃপতি শর্ত জুড়ে দিলেন 'চোখ বেঁধে কাজ করা চাই, দেব মূর্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে। পারবে?' নৃপতির এ-আদেশের কারণ, অন্ত্যজ কিরাত জাতের দৃষ্টি-কলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করবার আর কোন উপায় নেই। রাজার প্রস্তাব শুনে মাধব বলল, 'অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী। যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলবো না।' মন্দির প্রাচীরের সংস্কার কাজ চলতে লাগলো; অন্ধমাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়, পাথর তাতে সাড়া দেয়। ওদিকে তাড়া আসতে লাগলো রাজার পক্ষ থেকে। রাজপণ্ডিত বললেন, একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ—সেদিনই পূজা হতে হবে: সুতরাং মাধবের প্রতি রাজার তাড়া আরো বেড়ে গেল। অবশেষে একাদশীর রাত্রে মাধব দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রহরীকে দিয়ে রাজার কাছে সংবাদ পাঠালো তার কাজ শেষ; পূজার আয়োজন হোক দ্রুত, যেন লগ্ন বয়ে না যায়। প্রহরী খবর নিয়ে ছুটলো রাজার কাছে। আর মাধব? খুলে ফেললো চোখের বন্ধন: দেখলো, মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশীর চাঁদের আলো দেবমূর্তির ওপরে। হাঁটু গেড়ে বসে এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল দেবতার দিকে। দু'চোখে জলের ধারা— যেন আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত ভক্তের দেখা দেবতার সঙ্গে। আর ওদিকে :

'রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।'

খ. শুচি

রামানন্দ পেয়েছেন গুরুর পদ। সারাদিন তার কাটে জপে তপে। রাজারানী এসেছেন মন্দিরে, পণ্ডিতেরা এসেছেন দূরদূরান্ত থেকে : এলেন নানা চিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল। কিন্তু সবাই মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পেল না। যারা হলো অধিকার বঞ্চিত তাদের দুঃখে রামানন্দের দেয়া প্রসাদ দেবতা অগ্রহণ করলেন। মন্দিরে লোকস্থিতির নামে ঠাকুরের অধিকার সংকুচিত করতে চাওয়ায় ঠাকুর রামানন্দকে ভর্ৎসনা করেন। দেবতার ভর্ৎসনায় রামানন্দের ঘুমন্ত চিত্ত জেগে ওঠে। তিনি বেরিয়ে পড়লেন ঠাকুরের মন্দিরে সকলকে আহ্বান করার জন্য। নদীর তীরে শবদাহে ব্যস্ত নাভা চণ্ডালকে হাত বাড়িয়ে বক্ষে নিলেন। বললেন, অন্তরে আমি এতোদিন ছিলাম মৃত, অচেতন, তাই তোমাকে দেখতে পাইনি। গেলেন তাঁতী কবিরের কাছে—দেখলেন সে গুনগুন করে গান গাইছে আর তাঁত বুনছে। রামানন্দ স্বামী জড়িয়ে ধরলেন তার কণ্ঠ। ব্যস্ত হয়ে কবীর বলল, প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান, জোলা, নীচ আমার বৃত্তি। রামানন্দ স্বামী প্রতিউত্তরে বললেন, এতদিন তোমার সঙ্গ পাইনি বন্ধু তাই অন্তরে আমি নগ্ন, চিত্ত আমার ধূলায় মলিন, আজ আমি তোমার হাতের শুচিবস্ত্র পরব—তাতে আমার লজ্জা দূর হবে। ওদিকে শিষ্যেরা মন্দিরে রামানন্দ স্বামীকে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে এসে পেল কবীরের কাছে— তাদের খণ্ড-ভক্তপ্রাণ ধিক্কার জানালো রামানন্দকে; আর ভর্ৎসনার উত্তরে রামানন্দ স্বামী বললেন, আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলাম আজ তাঁকে সেখানে খুঁজে পেয়েছি। রামানন্দের উত্তর শুনে সূর্য উঠল আকাশে, আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।[১০] অর্থাৎ অন্ধকার রাতে রামানন্দ যে ঈশ্বরকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তাঁকে পাবার পর তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হলো সূর্যের আলোয়— যেন পেছনে ফেলে এলেন অন্ধকারের রাজত্ব।

গ. রঙরেজিনী

সম্পূর্ণ কবিতাটিই এখানে উদ্ধৃত করা হল–

'শঙ্করলাল দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত।
শাণিত তার বুদ্ধি
শ্যেনপাখির চঞ্চুর মতো,
বিপক্ষের যুক্তির উপর পড়ে বিদ্যুদ্‌বেগে—
তার পক্ষ দেয় ছিন্ন করে;
ফেলে তাকে ধুলোয়।

রাজবাড়িতে নৈয়ায়িক এসেছে দ্রাবিড় থেকে।
বিচারে যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী।
আহ্বান স্বীকার করেছেন শঙ্কর,
এমন সময় চোখে পড়ল পাগড়ি তার মলিন।
গেলেন রঙরেজির ঘরে।

কুসুম ফুলের খেত, মেহেদি বেড়ায় ঘেরা।
প্রান্তে থাকে জসীম রঙরেজি।
মেয়ে তার আমিনা, বয়স তার সতেরো।
সে গান গায় আর রঙ বাঁটে,
রঙের সঙ্গে রঙ মেলায়
বেণীতে তার লাল সুতোর ঝালর,
চোলি তার বাদামি রঙের,
শাড়ি তার আশমানি।
বাপ কাপড় রাঙায়,
রঙের বাটি জুগিয়ে দেয় আমিনা।

শঙ্কর বললেন, জসীম,
পাগড়ি রাঙিয়ে দাও জাফরানি রঙে
রাজসভায় ডাক পড়েছে।
কুল্‌কুল করে জল আসে নালা বেয়ে কুসুম ফুলের খেতে;
আমিনা পাগড়ি ধুতে গেল নালার ধারে তুঁত গাছের ছায়ায় বসে।
ফাগুনের রৌদ্র ঝলক দেয় জলে,
ঘুঘু ডাকে দূরের আম বাগানে।
ধোওয়ার কাজ হল, প্রহর গেল কেটে।
পাগড়ি যখন বিছিয়ে দিল ঘাসের 'পরে
রঙরেজিনী দেখলো তারি কোণে
লেখা আছে একটি শ্লোকের একটি চরণ--
'তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে'।
বসে বসে ভাবল অনেকক্ষণ,
ঘুঘু ডাকতে লাগল আমের ডালে;

রঙিন সুতো ঘরের থেকে এনে
আরেক চরণ লিখে দিল–
'পরশ পাই নে তাই হৃদয়ের মাঝে'।

দু'দিন গেল কেটে
শঙ্কর এল রঙরেজির ঘরে।
শুধালো, পাগড়িতে কার হাতের লেখা?
জসীমের ভয় লাগল মনে।
সেলাম করে বললে, 'পণ্ডিতজি,
অবুঝ আমার মেয়ে,
মাপ করো ছেলে মানুষি।
চলে যাও রাজসভায়—
সেখানে এ লেখা কেউ দেখবে না, কেউ বুঝবে না।'
শঙ্কর আমিনার দিকে চেয়ে বললে,
'রঙরেজিনী,
অহংকারের -পাকে-ঘেরা ললাট থেকে নামিয়ে এনেছ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।
রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল,
আর পাব না খুঁজে।'[১১]

'রঙরেজিনী' কবিতার সম্পূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য, এখানে যে কাহিনীক্রম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যবহার করেছেন তার উৎস অনুসন্ধান করা।

ঘ. প্রেমের সোনা

রবিদাস চামার পথের ধুলো ঝাঁট দেয়: সজন রাজপথ তার কাছে বিজন— কারণ পথিকেরা সযত্নে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে। গুরু রামানন্দ প্রাতঃস্নান সেরে দেবালয়ে যাচ্ছেন। দূর থেকে ধুলোয় মাথা ঠেকিয়ে রবিদাস গুরুকে প্রণাম জানালো। রামানন্দ তার পরিচয় জানতে চাইলেন। রবিদাস জবাব দিল, আমি শুকনো ধুলো—প্রভু, তুমি আকাশের মেঘ, তোমার প্রেমের ধারা ঝরে পড়লে গান গেয়ে উঠবে ধুলো রঙ বেরঙের ফুলে। অসাধারণ এ উত্তর শুনে রামানন্দ রবিদাসকে বুকে টেনে নিলেন। সে-প্রেমে রবিদাসের কণ্ঠে অপূর্ব গান জাগলো। চিতোরের রানী

ঝালির কানে পৌঁছুল রবিদাসের গান। তার মন উদাস হয়ে উঠল, চোখে এল জল, আর সে জলে তার মান ধুয়ে গেল। রবিদাস চামারের কাছে হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন। এ-সংবাদে রাজকুল পুরোহিত মর্মাহত হলেন— ধিক্কার জানালেন রানীকে। ধিক্কারের জবাবে রানী বললেন, ঠাকুর শোন তবে, আচারের হাজার গ্রন্থি, দিনরাত্রি কেবল বাঁধো শক্ত করে। বাঁধতে বাঁধতেই প্রেমের সোনা কখন খসে পড়েছে জানতে পারিনি তা। আমার ধুলো মাখা গুরু ধুলোর খেতে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছে। অর্থহারা বাঁধনের গর্বে তুমি থাকো কঠিন হয়ে। আমি সোনার কাঙালিনী, ধুলোর সে-দান মাথায় করে নিলেম।[১২]

ঙ. মুক্তি

বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক। গ্রাম থেকে এসেছে কীর্তনী—অন্ত্যজ বলে মন্দিরে তার স্থান নেই। সে বসেছে অঙ্গনের এক কোণে পিপুল গাছের তলায়; একতারা বাজিয়ে বারবার গানের ধুয়া তোলে, 'ঠাকুর, তোমায় কে বসালো কঠিন সোনার সিংহাসনে।' তার সে গান শুনতে পায় বাজিরাও পেশোয়া। কীর্তনী গেয়ে চলে, 'প্রাণের ঠাকুর, এরা কি পাথর গেঁথে তোমায় রাখবে বেঁধে।....থাকগে ওরা পাথরখানা নিয়ে পাথরের বন্দীশালায়, অহংকারের-কাঁটার-বেড়া-ঘেরা।' মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বাজিরাও কীর্তনীর গান, গোপনে। প্রভাত হল, অভিষেকের আনুষ্ঠানিকতার জন্য পুরোহিত এলেন তীর্থ বারি নিয়ে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! দেখলেন, রাজবাড়ির ঠাকুরঘর শূন্য। জ্বলছে দীপ শিখা, পূজার উপচার পড়ে আছে —আর বাজিরাও পেশোয়া চলে গেছে পথের পথিক হয়ে।[১৩]

চ. স্নান সমাপন

প্রাতঃস্নান-নিরত রামানন্দ স্বামী গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন, হে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না। ঘোচাও তোমার আবরণ। এদিকে পূজার সময় গত হয় দেখে তীরে দাঁড়ানো শিষ্য তাড়া দেয়। রামানন্দ বলেন, শুচি হয়নি তনু, গঙ্গা রইলেন আমার হৃদয় থেকে দূরে। দীর্ঘক্ষণ পরে উঠলেন জল ছেড়ে—চললেন বনঝাউ ভেঙে গাঙশালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে। শিষ্য প্রশ্ন করল, প্রভু কোথায় যাও, ওদিকে তো ভদ্র পাড়া নেই। গুরু বললেন, চলেছি স্নান সমাপনের পথে। বালুচর ডিঙিয়ে, তেঁতুল গাছের ঘন ছায়া মাড়িয়ে, ছোটগলির মধ্যে চামড়ার তীব্র গন্ধ উপেক্ষা করে পৌঁছলেন ভাজন মুচির ঘরে। ভাজন তাঁকে দূর থেকে

প্রণাম করে সাবধান করলেন—কিন্তু গুরু তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। হায়, হায় করে উঠল ভাজন মুচি—তাকে অভয় দিয়ে রামানন্দ স্বামী বললেন, ভগবান সূর্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল। দেবতাকে বললাম, হে দেব, তোমার মধ্যেও যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি, তবু আজ দেখা হল না কেন। এতোক্ষণে মিলল তার দর্শন তোমার ললাটে আর আমার ললাটে—মন্দিরে আর হবে না যেতে।[১৪]

উপর্যুক্ত ছ'টি কবিতায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সম্পর্কে রবীন্দ্র-মানসের মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা দিয়েছে ভক্তির অতুলনীয় উৎসার—যা মানবিক কলুষকে দূরীভূত করে, মানুষকে করে তোলে শুদ্ধ প্রাণের আধার। ধর্ম নয়, বর্ণ নয়, জ্ঞানের অহং নয়—চিত্তের পরিশুদ্ধিই মানুষকে পূর্ণ করে। রবীন্দ্র-বিবেচনায়, মানব-পরিচয় মানবিকতা দিয়ে—লোকাচার, ধর্মাচার বা জ্ঞানাচার দিয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথের এ মানসিকতা আরো বেশি স্বয়ংপ্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত দুটি মন্তব্যে :

ক. 'অবশ্য ধর্মমত আমার আছে কিন্তু কোন সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করিনে।'[১৫]

খ. 'আমি আজন্ম ব্রাত্য। মর্ত ধরণীর বুকের কাছে আমার বাসা—এখানকার মাটির ভাঁড়ে যে অমৃত পাই তাই আমার যথেষ্ট। পারত্রিকের ঠিকানা জানি নে, যারা সেখানকার বিবরণ জটিল ভাষায় বিস্তারিত করে বলতে আসে তাদের কথা বুঝতেও পারিনে, বিশ্বাসও করিনে। সকল জাতির সকল শাস্ত্রই দৈবদত্ত নিখুঁত সত্যের অহঙ্কার করে অথচ তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আদায় কাঁচকলায়। মধ্য আফ্রিকার বর্বরও তাদের নিরর্থক আচারকে ধর্মের পদবী দিয়ে তার শুচিতার অভিমানে রোমাঞ্চিত, আমাদেরও সেই একই দশা। এই পরস্পর প্রতিযুধ্যমান শাস্ত্রকে আমি দূর থেকে নমস্কার করি—শ্রেয়োবোধের অনুমোদিত শুচিতাকেই পালন করতে আমার প্রয়াস—যে বাহ্য আচার মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে প্রাচীর তুলে বেড়ায় মানবপ্রেমকে, ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে শাস্ত্রের অক্ষর বাঁচাবার জন্যে খুনোখুনি করতেও অগ্রসর হয় তাকে বর্জ্জন করে নাস্তিক অধার্মিক পদবী নিতে আমার কোন সঙ্কোচ নেই।'[১৬]

মানব-প্রীতির যে উদার, নিঃসঙ্কোচ মানসিকতা এ-কবিতাগুলোর বক্তব্যে পরিপূরিত তার তুলনা রবীন্দ্রসাহিত্যেই শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যেও অপ্রচুর। 'স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ-বোধের পূর্ণায়ত নাট্য-প্রকাশ পাওয়া যায়

'কালের যাত্রা' নাটকে। কেউ-কেউ গান্ধিজির হরিজন আন্দোলনকেও উপর্যুক্ত কবিতাগুচ্ছের আভ্যন্তরীণ প্রেরণা- অভিঘাত বলে চিহ্নিত করেছেন।[১৭]

নির্বাচিত কবিতাগুলোর সম্ভাব্য সৃষ্টি-প্রেরণা ও কাহিনী-উৎস সম্পর্কে আমার বিবেচনা প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বিবৃত হবে।

তিন

'রঙরেজিনী' ও অপর পাঁচটি (যে কবিতাগুলো অনতি-পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) কবিতায় যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে আমি তার উৎস এবং কবিতাগুলোয় উল্লিখিত চরিত্রগুলোর বাস্তব-ভিত্তি সন্ধানের চেষ্টা করি নানা সূত্রে। *পুনশ্চ* সম্পর্কে যে সমস্ত গ্রন্থে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তার কোনটিতেই, আমার পরীক্ষিত,[১৮] কবিতাগুলোর কাহিনী-উৎস সম্পর্কে কোন সূত্র-উল্লেখ নেই; অথচ *কথা ও কাহিনীর* উৎস সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট উল্লেখ : *'এই গ্রন্থে (কথা ও কাহিনী) যে সকল বৌদ্ধকথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরেজি গ্রন্থ[১৯] হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই একটি ইংরাজি শিখ-ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল[২০] হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছে। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে। আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্যনীতি-বিধান মতে দণ্ডনীয় হইবে না।'*[২১] যদিও *পুনশ্চ*-এর দু-একটি কবিতার উৎস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নানা পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন কেউ কেউ[২২] কিন্তু 'রঙরেজিনী' এবং অন্য যে পাঁচটি কবিতা এখানে আমি উল্লেখ করেছি তার উৎস সম্পর্কে তেমন কোন তথ্যাভাস নেই। কোথাও-কোথাও কবিতাগুলোর যে কল্পিত-উৎস নির্দেশিত হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর *রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে* (১৩৬৬) গ্রন্থে এ-রকম একটি মন্তব্য করেছেন: 'পল্লীর এই সমস্ত অখ্যাত বৈষ্ণব, বাউল, কবিয়াল, চাষী গৃহস্ত, শিক্ষক- এদের নিভৃত সাহচর্য নবনব সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার অজস্র সৃষ্টি ও মানবতার সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অবদানের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা না জানলে রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ দর্শন লাভ হতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথের এ-মন্তব্যের কাব্য-নিদর্শন উপস্থিত করতে গিয়ে বাসন্তী চক্রবর্তী বিভ্রান্তিকরভাবে বলেছেন, 'বলাবাহুল্য, এই সমস্ত জীবন থেকেই কবি পরবর্তীকালে 'মাসিক তিনটাকা মাইনের গুরু,' 'ছেঁড়া ছাতি মাথায়' (কোপাই *পুনশ্চ*), 'একজন লোক', (*পুনশ্চ*), 'সাধারণ মেয়ে,' জসীম

('রঙরেজিনী'–*পুনশ্চ*) 'মাধব' (প্রথম পূজা –*পুনশ্চ*), ভাজন মুচি (স্নান সমাপন-*পুনশ্চ*) প্রভৃতি *পুনশ্চ* কাব্যের চরিত্রগুলিকে সংগ্রহ করেছেন।'[২৩] এ সমস্ত কবিতায় যে চরিত্রগুলো উঠে এসেছে তার মধ্যে কয়টি চরিত্রের উৎস বাংলাদেশের পল্লীজনজীবনে নিহিত আর কতগুলো অন্য উৎস থেকে আহৃত তা প্রশ্নসাপেক্ষ। 'কোপাই, 'পুনশ্চ', 'সাধারণ মেয়ে' প্রভৃতি কবিতা ব্যতীত অপর কবিতাগুলোর চরিত্র-নাম নয়, পরিণামী বক্তব্যের দিকে যদি আমরা মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তাহলে অন্যবিধ উৎসে তাদের সৃষ্টি প্রেরণা খুঁজে পাব। 'রঙরেজিনী'-সহ অপর পাঁচটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভক্তিবাদী, মানবতাবাদী ও সর্বমানবের প্রতি শ্রেণী-কৌলিন্য-হীন আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধির অস্পৃশ্যতাবর্জন আন্দোলন, এবং সে-সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে কবিতাগুলো রচনার অব্যবহিত পূর্বে কবির রাশিয়া ভ্রমণের বাস্তবভিজ্ঞতা, যেখানে তিনি দেখেছিলেন সর্বমানবের শ্রেণীহীন এক বৃহৎ মেলা, হয়তো কবিকে প্রণোদনা দিয়েছিল ব্যতিক্রমী এ-সব কবিতা রচনায়। কিন্তু তিনি চেতনা-উপযোগী যথার্থ আধার অন্বেষণে শরণ নিয়েছিলেন অন্যত্র: আর সে চেতনা-উপযোগী আধার রবীন্দ্রনাথ পল্লী–বাংলার জনজীবন থেকে যত-না আহরণ করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি শরণাগত হয়েছিলেন কবীর, দাদু, নানক প্রভৃতি ভক্তিবাদী প্রমূর্ত-মানবিকদের জীবনকাহিনী ও সাহিত্য-দর্শনে।

এ-তথ্য রবীন্দ্র সাহিত্যের সাধারণ পাঠকও অবগত যে ভক্তমাল-এর কাহিনীগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন পূর্ণাঙ্গরূপেই। প্রশান্ত পালের *রবিজীবনী* থেকে জানা যায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাংলা ভক্তমাল-এর হস্তলিখিত পুঁথি রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে ছিল, যা তিনি পরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে অনুদান হিসেবে প্রদান করেন।[২৪] ভক্তমাল-এর ভক্তিবাদী বক্তব্য ও ভক্তগণের অপূর্ব জীবনকাহিনী রবীন্দ্রনাথকে উদ্বোধিত করেছিল বলেই তিনি ইতঃপূর্বে *কথা ও কাহিনী*-এর কবিতাগুলো রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই *পুনশ্চ*-এর উল্লিখিত পাঁচটি কবিতার ('রঙরেজিনী' ব্যতীত) কাহিনী-উৎস ও চরিত্রগুলোর পরিচিতি ভক্তমাল ও মধ্যযুগের হিন্দি ভাষার সন্ত কবিদের জীবন-পরিক্রমায় অনুসন্ধান করাই যথাযথ। আমার বিবেচনায় : রামানন্দ স্বামীর কাহিনী যে তিনটি কবিতায় ('শুচি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নান সমাপন') রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তা, কবীর যে রামানন্দের শিষ্য[২৫] ছিলেন তাঁকে কেন্দ্র করেই রচিত। কারণ কবীরের জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল, অকৃত্রিম ও আজীবন। সুতরাং রামানন্দের জীবনেতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত এ-ধরনের কাহিনী অবহিত হওয়া তাঁর জন্য

তেমন কষ্টকর ছিল না বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। 'শুচি' কবিতায় যে নাভা চণ্ডালের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় তার সঙ্গে ভক্তমালের রচয়িতা নাভাদাসের সাদৃশ্য রয়েছে। অনেকেই নাভাকে চণ্ডাল বলেছেন।[২৬] এবং এ কবিতাতেও নাভাকে রবীন্দ্রনাথ চণ্ডাল বলেই উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'প্রেমের সোনা' কবিতায় যে রবিদাস চামার ও 'স্নান সমাপন' কবিতায় যে ভাজন মুচির কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে রামানন্দের শিষ্য রবিদাস বা রৈদাস চামারের বৈলক্ষণ্য রয়েছে।[২৭] সুতরাং কবিতাগুলোর কাহিনী উৎস ও চরিত্র-পরিচিতি গ্রাম বাংলার জনপ্রকৃতিতে অনুসন্ধেয় নয় বরং *ভক্তমাল*-এ উল্লিখিত কবিদের জীবনবৃত্তেই অনুসন্ধান যুক্তিযুক্ত।

'রঙরেজিনী' কবিতাটির কাহিনী-উৎস পাওয়া যায় অন্যত্র : মধ্যযুগের হিন্দি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি 'আলম'-এর জীবনেতিহাসের সঙ্গে এ কবিতাটির কাহিনীক্রমের সাদৃশ্য আশ্চর্যজনক। আমি রামচন্দ্র শুক্লের *হিন্দি সাহিত্য কা ইতিহাস গ্রন্থ* থেকে কবি আলমের জীবনেতিহাসের প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উপস্থাপন করছি : 'আলম—ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং শেখ নামের এক রঙরেজিনীর প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়ে তাকে বিয়ে করে জীবনযাপন করতে থাকেন। আলম এবং শেখের একটি পুত্র হয়েছিল যার নাম ছিল জাহান। আলম আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয়পুত্র মুঅজ্জমের আশ্রয়ে ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে বাহাদুর শাহ নামে সিংহাসনে বসেন। অতএব আলমের কবিতার রচনাকাল সম্বত[২৮] ১৭৪০ থেকে ১৭৬০ বলে গ্রাহ্য করা যায়। তাঁর কবিতার একটি সংগ্রহ '*আলমকেলি*' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে সংগৃহীত কবিতামালা ছাড়াও তাঁর আরো সুন্দর ও উৎকৃষ্ট কবিতার সংগ্রহ পাওয়া যায় ও লোক মুখে শুনতে পাওয়া যায়। শেখ রঙরেজিনও চমৎকার কবিতা রচনা করতেন। বলা হয় যে, আলম একবার শেখকে তাঁর পাগড়ি রাঙানোর জন্য দিয়েছিলেন। পাগড়ির খুঁটে ভুলক্রমে কাগজের একটি টুকরো বাঁধা ছিল। টুকরোটিতে দোহার একটি আধা পংক্তি লেখা ছিল–*কনক ছরি সি কামিনী কাহে কে কটি ছিন*, শেখ ঐ দোহার অর্ধপংক্তিটি এভাবে পূর্ণ করেন : *কটিকে কাঞ্চন কাটি বিধি কুচন মধ্য ধরি দিন*, পংক্তিটি পূর্ণ করে কাগজের টুকরো যেভাবে বাঁধা ছিল সেভাবে বেঁধে পাগড়ি তাঁকে ফেরত দিয়ে দিল। ঐ দিনের পর থেকে আলম পুরোপুরি শেখের প্রেমে পড়েন এবং অবশেষে তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। শেখ খুব বুদ্ধিমতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্না ছিলেন। একবার শাহজাদা মুঅজ্জম পরিহাসোচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন 'তাহলে আপনিই আলমের (পৃথিবীর) স্ত্রী ?' (*ক্যয়া আলম কী ঔরত আপ হী হুঁ ?*)

শেখ অত্যন্ত দ্রুত এ-কথার নিগূঢ় শ্লেষ উপলব্ধি করে উত্তর দেন, জী, জাঁহাপনাহ জাহানের (পৃথিবীর) মা আমিই। (*হাঁ, জহাঁপনাহ জহান কী মা মেয়ে হী হুঁ।*) 'আলমকেলি'র অনেক কবিতাই শেখের রচনা। এমনকি আলমের নামে প্রচলিত অনেক রচনাই শেখের লেখা বলে অনুমান করা হয়।

আলম রীতিবদ্ধ রচনাকারী কবি ছিলেন না। তিনি প্রেমতন্ময় কবি ছিলেন এবং আপনার হৃদয়তরঙ্গ অনুসারে কবিতা রচনা করতেন। এজন্য তাঁর কবিতায় হৃদয় তন্ময়তার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের পীড়ন (*প্রেম কী পীড়*) ভালবাসার বেদনায় (*ইশক কা দর্দ*) তাঁর প্রতিটি বাক্য পরিপূরিত। উৎপ্রেক্ষা নির্মাণেও তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। শব্দ বৈচিত্র্যে, অনুপ্রাস নির্মাণে তাঁর বিশেষত্ব রয়েছে। শৃঙ্গার রসের উন্মাদনাময়ী এমন সব উক্তি তাঁর রচনায় পাওয়া যায় যে পাঠক-শ্রোতা তাতে লীন হয়ে যান। এ ধরনের তন্ময়তা কেবল ভালবাসার অকৃত্রিম উপলব্ধির মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। রেখ্তা বা উর্দু ভাষাতেও ইনি কবিতা রচনা করেছিলেন। এ কবির ভাষা পরিমার্জিত ও সুব্যবস্থিত। প্রেমতন্ময় রচনা হিসেবে আলমের কাব্য রসখান ও ঘনানন্দের রচনার সঙ্গে তুলনীয়।'[২৯]

আরো কয়েকটি সূত্রে কবি আলমের নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায় :

ক. Alam (fl-1703) was a Brahman who fell in love with a Muhammadan woman named Shekh Rangrezin, who was a dyer by trade. He became a Muhammadan and married her. Shekh Rangrezin also wrote poetry. Alam was ~~in the service of~~ Muazzam Shah, son of Aurangzeb. His poetry is considered to be very beautiful.[৩০]

খ. Alam (a Muslim, who wrote an artistic romance *Madhavanala-Kamkandala* round about 1580)[৩১]

গ. The poet Alam B. 1700 A.D : He was originally a Sanadhya Brahman, but falling in love with a Muhammadan woman, a dyer by trade, he turned Musalman, and was for a long time in the service of prince Muazzam Shah, son of the emperor Aurangzeb (1658-1707) and afterwards the emperor Bahadur Shah (1707-1712). His poems are said to be very beautiful.[৩২]

হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাসে আলম নামে দু' জন কবির অস্তিত্ব রয়েছে: একজন *মাধবানল-কামকন্দলা* -এর রচয়িতা[৩৩] অন্যজন '*আলমকেলি*'র রচয়িতা। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন *মাধবানল-কামকন্দলা*-এর

সম্পাদক শ্রীগণেশপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর *হিন্দি প্রেমগাথাকাব্য-সংগ্রহ* গ্রন্থে।[৩৪] একারণে রামচন্দ্র শুক্ল *মাধবানল-কামকন্দলা*-এর রচয়িতা আলমকে 'আদিকাল বা বীর গাথাকালে'র এবং *আলমকেলি*-এর রচয়িতা আলমকে 'উত্তরমধ্যকাল বা রীতিকালে'র কবি বলে নির্দেশ করেছেন।[৩৫] এ বিতর্ক অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের পরিধি বহির্ভূত।

আলমকেলি-এর রচয়িতা কবি আলমের জীবনেতিহাসের প্রসঙ্গে, প্রত্যেকেই প্রায়, একজন রঙরেজিনীর উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের প্রেম ও পরিণয়ের প্রসঙ্গ বিবৃত করেছেন। আমার বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথ কবি আলমের জীবনেতিহাসকে অবলম্বন করেই তাঁর 'রঙরেজিনী' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। এ ধারণা সত্য প্রমাণের জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিন্দি সাহিত্যের, বিশেষত ঐ কাহিনীটির পরিচয়-সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

চার

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই কিঞ্চিৎ-অধিক ধারণা পোষণ করি। সংস্কৃত সাহিত্য ও পদাবলী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ তাঁর সমকালে এবং একালেও প্রায় তুলনাহীন।[৩৬] সে-সূত্র ধরে প্রতিবেশী ভাষা হিসেবে হিন্দির সঙ্গে যে একটি সহজ-পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ছিল আমরা তা অনুমান করতে পারি। কৈশোরে তিনি দেখেছেন অগ্রজদের হিন্দি গান ভেঙে বাংলায় ব্রাহ্ম সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপের কুশলতা।[৩৭] তিনি নিজে মাঝে মাঝে হিন্দিগান গাইতেন[৩৮] এবং হিন্দিগান সম্পর্কে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ধারণা পোষণ করতেন।[৩৯] কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দিবাংলা মিশিয়ে এমন একটি পদ্যও রচনা করেছেন—

'কলকত্তামে চলা গয়ো রে সুরেন বাবু মেরা,
সুরেন বাবু, আসল বাবু, সকল বাবুকো সেরা।
খুড়া সাবকো কায়কো নহি পাতিয়া ভেজো বাচ্ছা
মহিনাভর কুছ খবর মিলেনা ইয়েত নহি আচ্ছা
মনকে দুঃখে হু হু করকে নিকলে হিন্দুস্তানী-
অসম্পূর্ণ ঠেকতা কানে বাঙ্গালাকো জবানী।...
তুম ছাড়া কোই সমজে না ত হমরা দুরবস্তা,
বহিন তেরি বহুত merry খিলখিল করকে হাস্তা!
চিঠি লিখিও মাকে দিও বহুৎ বহুৎ সেলাম
আজকের মত তবে বাবা বিদায় হোকে গেলাম।'[৪০]

অধিকন্তু, রবীন্দ্র-জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি গিয়েছিলেন হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভরতপুরে, যদিও সেখানে গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতীর জন্য মুদ্রা-সংগ্রহ।[৪১] *শব্দতত্ত্ব* রচনা করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিন্দি ভাষার আন্তরিক পরিচয় ঘটে। উক্ত গ্রন্থের 'বাঙ্গালা বহুবচন' প্রবন্ধের শেষে তিনি যে উল্লেখপঞ্জী প্রদান করেছেন তাতে A.F.R. Hoernle রচিত *A Grammar of Eastern Hindi Compared with the other Gaudian Language*, 1880; ও S.H. Kellegg -এর *A Grammar of the Hindi Language*, 2nd ed. 1893, গ্রন্থ দু'টির উল্লেখ রয়েছে।[৪২]

তবে, এ ধরনের পরিচয়সূত্র রবীন্দ্রনাথকে কতটা হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি, বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি উদ্বোধিত ও আগ্রহী করেছিল তা প্রশ্ননিরপেক্ষ নয়। কিন্তু হিন্দি সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্ভাব্য-পরিচয়ের যে-সকল তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হল তাকে আবার ঊনমূল্য বলে অবহেলা করাও অসঙ্গত। উপর্যুক্ত তথ্যগুলো থেকে অন্তত এ-টুকু নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, হিন্দি ভাষা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ অধিকার না থাকলেও অনধিকার ছিল না। প্রকৃত অর্থে হিন্দি সাহিত্যের, বিশেষত মধ্যযুগের হিন্দি সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ও নিবিড়তা গড়ে ওঠে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী-কে উপলক্ষ করে। ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০–১৯৬৪) কাশীর কুইনস কলেজ থেকে সংস্কৃত এম. এ. করেন এবং 'শাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি যখন হিমালয়ের চম্বা রাজ্যের শিক্ষা সচিবের পদে অধিষ্ঠিত তখন রবীন্দ্রনাথের বারংবার অনুরোধের পর ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে সচিব পদ পরিত্যাগ করে শান্তি নিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দেন।[৪৩] যাদের ওপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বিশ্বভারতীতে পরিণত করেন ক্ষিতিমোহন তাদের অন্যতম। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্ত পাল এই মহানুভব সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, *'ক্ষিতিমোহনের শাস্ত্রজ্ঞতার সঙ্গে আচারেই ঔদার্য তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) মুগ্ধ করেছে। মধ্যযুগের সন্ত সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান, অন্তত বাংলাদেশে, ক্ষিতিমোহনের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। এই সাহিত্য ও জীবন দর্শনে রবীন্দ্রনাথকে ক্ষিতিমোহনই দীক্ষিত করেছিলেন, যা পরবর্তী কয়েক বছরে তাঁর জীবন সাধনায় ও কাব্যরূপে বিপুল পরিবর্তন আনয়ন করেছিল।*[৪৪] অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন অপর রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *'ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে কবীর ও মধ্যযুগীয় সন্তদের সম্বন্ধে তথ্য ও তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে কবির ধর্মচেতনা ব্যাপক ও গভীরতর হতে থাকে। ধর্মের বিশেষত্ব ও বিশ্বত্ব যুগপৎ কবির মনকে পূর্ণ করেছে।*[৪৫] ক্ষিতিমোহন সেন

বাল্যকাল হতেই উত্তর ভারতের ও কাশীর নানা তীর্থে বসবাস ও ভ্রমণকালে কবীর রচিত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ও তাতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শান্তি নিকেতনে যোগদানের পর আশ্রম-আচার্যের প্রেরণায় ও সহায়তায় তিনি মধ্যযুগের সন্ত সাহিত্যিকদের রচনা-সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠেন। ক্ষিতিমোহনের সংগ্রহ তৎপরতা রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত তদারক করতেন এবং কবীরের দোহার ক্ষিতিমোহনকৃত বাংলা অনুবাদের মনোযোগী শ্রোতা ছিলেন তিনি, এবং 'চাঁদকবি, তুলসীদাস প্রভৃতি কবির মূল রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, তা ছাড়া কবীরের জীবন ও রচনার সঙ্গে যে তাঁর কিছু পরিচয় ছিল তার প্রমাণ দুর্লভ নয়।'[৪৬] সে পরিচয়-সুবাদেই কবীরের জীবনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন 'অপমান-বর', তুলসীদাসের মহিমা আশ্রয় করে 'স্বামীলাভ' ও সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্য মাহাত্ম্য-জ্ঞাপন করে 'স্পর্শমণি' কবিতাটি। তিনটি কবিতাই *কথা ও কাহিনী*-এর অন্তর্গত। হিন্দি সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়-সম্পর্ক বিবেচনার ক্ষেত্রে অপর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যায় : *গীতাঞ্জলি*-এর মূল পাণ্ডুলিপি, যেটি ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহে ছিল, তার শুরুতে কালি দিয়ে, একটি পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করে কবীর, তুলসীদাস প্রমুখ সন্ত কবিদের আঠারোটি হিন্দি দোহা লেখা আছে। ড. রামেশ্বর মিশ্র মনে করেন এগুলো রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর[৪৭] *গীতাঞ্জলি*র পাণ্ডুলিপিতে হিন্দি দোহার উপস্থিতি হিন্দি সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি-সম্পর্কের কথাই প্রমাণ করে।

কবীরের দোহাগুলোর ইংরেজি অনুবাদের সূত্রে হিন্দি সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়। ক্ষিতিমোহন সেনের কবীর-সংগ্রহকে অবলম্বন করে অজিতকুমার চক্রবর্তী ইংরেজিতে দোহাগুলো প্রথমে অনুবাদ করেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেন তখন তিনি সঙ্গে করে নিয়েছিলেন সেগুলো; ভেবেছিলেন, খানিকটা সংশোধন করে ইংরেজিতে মুদ্রণ উপযোগী করে তুলবেন। কিন্তু সংশোধন করতে গিয়ে প্রতিটি অনুবাদ পরিগ্রহ করলো নতুন রূপ, অধিকাংশই হল পুনর্লিখিত— যাতে অজিতকুমার চক্রবর্তীর উপস্থিতি হয়ে উঠল গৌণ। তা ছাড়া ইংল্যান্ডের প্রকাশকেরা একজন প্রায়-অপরিজ্ঞাত অনুবাদকের অনুবাদ প্রকাশ করতে সম্মত না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ইভলিন আন্ডার হিলের সহায়তায় ও ভূমিকাসহ One Hundred Poems of Kabir প্রকাশ করেন ১৯১৪ সালে।[৪৮]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ক্ষিতিমোহন প্রায়ই হিন্দি থেকে কৃত কবীরের বাংলা অনুবাদ রবীন্দ্রনাথকে শোনাতেন এবং অনুবাদ সম্পর্কে মতামত নিতেন। সন্দেহ

নেই, ক্ষিতিমোহন সেন এবং রবীন্দ্রনাথের আলোচনা হতো তত্ত্ব-তথ্য ও মত বিনিময়মূলক, দ্বিপাক্ষিক। এ-রকম পারস্পরিক আদান-প্রদান, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দেয়া আর নেয়া', সূত্রেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ সংস্পর্শে এসেছিলেন মধ্যযুগের হিন্দি সাহিত্যের কবীর ব্যতীত অপর এক বিখ্যাত সন্ত কবি আলমের জীবনেতিহাসের সঙ্গে; আর সে-পরিচয়ের বীজ জন্ম দিয়েছিল 'রঙরেজিনী'র মত একটি অনন্য সাধারণ কবিতা।

কবি আলমের জীবন-ইতিহাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আরো দুটি গ্রন্থকে কেন্দ্র করে ঘটতে পারে বলে আমি মনে করি : একটি হচ্ছে Frank Ernest Keay-এর *A History of Hindi Literature* (1920) এবং অন্যটি George A. Grierson-এর *The Modern Vernacular Literature of Hindustan* (1989)। দুটি গ্রন্থেই কবি আলমের পরিচয় সূত্রে 'রঙরেজিনীর' প্রসঙ্গ উল্লেখ এবং তাদের বিয়ের স্বীকৃতি রয়েছে। প্রথম গ্রন্থটির কথা সুস্পষ্ট করে না বলা গেলেও গ্রীয়ারসনের মূল্যবান গ্রন্থটি যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব, তা অনুমান করার মত সঙ্গত কারণ বিদ্যমান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে যে ক'জন পাশ্চাত্য মনীষীর নাম উল্লেখ ও স্বীকৃতি প্রদান করা হতো গ্রীয়ারসন তাঁদের অন্যতম। গ্রীয়ারসন যখন প্রধানত বিদ্যাপতিকে অবলম্বন করেই তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar Containing a Grammar, Chrestomathy & Vocabulary* (1882) প্রকাশ করেন তখন রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল যত্নে ও মনোযোগের সঙ্গে ঐ গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত উক্ত গ্রন্থের পাতায় পাতায় তাঁর স্বহস্তে লিখিত বাংলা ও ইংরেজি শব্দার্থ, গদ্য ও পদ্যানুবাদের মধ্যে।[৪৯] ঐ গ্রন্থটির মাত্র কয়েক বছর পরে প্রকাশিত গ্রীয়ারসনের *The Modern Vernacular Literature of Hindustan* গ্রন্থটিও যে রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হবে এবং মনোযোগ আকর্ষণ করবে এমন ধারণা অমূলক নয়।

সুতরাং ক্ষিতিমোহন সেনের মাধ্যমেই হোক, বা গ্রীয়ারসনের গ্রন্থের মাধ্যমেই হোক রবীন্দ্রনাথ কবি আলম ও রঙরেজিনী শেখের কাহিনীটি অবহিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে কাহিনীটি প্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও কল্পনাজাগরণে সাহায্য করেছিল। আর সে কাহিনীর ক্ষুদ্র কিন্তু অনবদ্য সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয়েছিল 'রঙরেজিনী' কবিতাটি। তবে কাহিনীতে অনিবার্যভাবে সংযুক্ত হয়েছে নতুন শ্রীবিন্যাস, যা সৃজন প্রক্রিয়ার অজ্ঞাত কার্যকারণের রহস্যময় বিধানে গ্রথিত।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ

১ *পুনশ্চ* ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাসে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় 'পরিশেষ' হতে মোট ১৩টি কবিতা সংযোজিত করে পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ১৩৪০ সালের দ্বিতীয় সংস্করণটিরই পুনর্মুদ্রণ বাজারে প্রচলিত। বিশ্বভারতী হতে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী ষোড়শ খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণকেই প্রামাণ্য বিবেচনা করে সংকলন করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য–*রবীন্দ্র রচনাবলী* : ষোড়শ খণ্ড (বিশ্বভারতী; পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯১)

২ ড. ক্ষুদিরাম দাস সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকে মোট ন'টি পর্যায়ে বিভাজন করে তাঁর কাব্যালোচনা সম্পন্ন করেছেন। সেগুলো হচ্ছে : এক. প্রস্তাবনা; দুই. অপ্রকাশের কাল; বনফুল থেকে কড়ি ও কোমল; তিন. প্রতিভার উন্মেষ; মানসী ও সোনারতরী, চার,. প্রতিভার বিকাশ, প্রথম পর্যায় : চিত্রা; পাঁচ. প্রতিভার বিকাশ, দ্বিতীয় পর্যায় : চৈতালী থেকে নৈবেদ্য; ছয়. প্রতিভার বিকাশ, তৃতীয় পর্যায়-অরূপ অনুভবের প্রারম্ভ : নৈবেদ্য থেকে শারদোৎসব; সাত. প্রতিভার বিকাশ, চতুর্থপর্যায় অরূপ অনুভবের পূর্ণরূপ: গীতাঞ্জলি থেকে গীতালি; আট. প্রতিভার পরিণাম—জীবন ও অরূপের সমন্বয় :গীতালি-বলাকা-ফাল্গুনী-পূরবী-মহুয়া-মুক্তধারা-রক্ত করবী; নয়. গোধূলি পর্যায়: পরিশেষ, তাসের দেশ, কালের যাত্রা, পুনশ্চ থেকে শেষলেখা। দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক ড. ক্ষুদিরাম দাস, *রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়* (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা; চতুর্থ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৮৪) বিষয়সূচী অংশ।

৩ *পুনশ্চ* সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত :

ক. 'পরিশেষ এবং বিশেষভাবে পুনশ্চ-তে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি কবিতার রসের দিক থেকে যেমন হোক, রূপারোপের অভিনবতা : এ হ'ল অনুভূতির বাহনরূপে গদ্যছন্দের প্রবর্তন'।—ড. ক্ষুদিরাম দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪

খ. 'নৈঃশব্দ্যের তীরে এসে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন নতুন এক ভাবসমুদ্র। নতুন এক রীতিরও (কবি যার কাব্যিক নাম দিয়েছিলেন 'গদিক্যারীতি') প্রবর্তন হয় ঐ-দুখানি (*পরিশেষ* ও *পুনশ্চ*) বইতে, কিন্তু ভাবের দিক থেকে পরিবর্তন আরো লক্ষণীয় : সংশয়, প্রশ্ন, নৈরাশ্যের

তীব্র বেদনা', মানসিক দ্বন্দ্ব, তিক্ততা (রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যতোখানি তিক্ত হওয়া সম্ভব), সেই সঙ্গে 'সন্ন্যাসী মহাকালে'র কাছে দীক্ষা গ্রহণ একদিকে এবং অন্যদিকে পুরাদস্তুর মানবিকতাবাদ-এ সবেরই সূত্রপাত ঐ দুখানি পর্বান্তকারী কাব্যে।–আবু সায়ীদ আইয়ুব, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* (দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯২) পৃ. ১৪৩

গ. 'ইহা ছন্দোবদ্ধ গদ্যে লেখা কাব্য। গদ্যে লেখা হইলেও ইহার রচনার মধ্যে একটি ছন্দ আছে, তাল আছে; এবং কবিতার রস আছে।' —চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় '*রবিরশ্মি*, দ্বিতীয় খণ্ড (দে'বুক স্টোর, কলিকাতা, ১৩৯৬)পৃ. ৩১৪

ঘ. 'তবে একথা অবশ্যই মানতে হবে যে বহুতর কবিতার মধ্যেই তিনি সহজের সঙ্গে কঠিনকে এবং গভীরকে মিলাতে পেরেছেন। গদ্যের সঙ্গতি রেখে কাব্যের প্রসাদগুণ ফুটিয়ে তুলেছেন। এর ফলে যে কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে তাতে তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে 'চিরকালের স্তব্ধতা আছে আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।' —হীরেন্দ্র দত্ত, *রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য* (কথাশিল্প, কলিকাতা, ১৩৭৯) পৃ. ৯৪

৪ *পুনশ্চ*-এর কবিতাগুলোর বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি মতামত :

ক. (*পুনশ্চ*)-এর অনেকগুলি কবিতায় কবি সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করতে চেয়েছেন—যার বাইরে আছে ক্ষুদ্র কাহিনী, সর্বত্র বিজড়িত আছে বাস্তবতাময় সহানুভূতি। রবীন্দ্রনাথের যে কবিমানস অতুলনীয় ছোটগল্পগুলির সৃষ্টি করেছে, তা-ই গদ্যচ্ছন্দের সুবিস্তৃত বাহন অবলম্বন করে সহজেই কাব্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বাস্তবতার মধ্যে বিচরণ করেছে। ছোটগল্পের নাটকীয় পরিণামও কয়েকটি কবিতায় লক্ষণীয়। –ড. ক্ষুদিরাম দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২

খ. 'শেষ পর্যায়ের (*পূরবী* থেকে *শেষলেখা* পর্যন্ত) রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশী বাস্তব। জীবনের অন্যান্য পর্বে কবির চিন্তা আদর্শলোক ও সৌন্দর্য বিহারী হলেও তাঁর চিন্তা কখনো পৃথিবী ও মানবকে ত্যাগ করেনি। শেষ পর্যায়ে এসে এই চিন্তা আরও সমৃদ্ধতর ও বিচিত্রতর হয়েছে।' —ড. খনা মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়* (জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৭৮)পৃ. ২১

গ. 'দার্শনিকতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত কয়েকটি আশ্চর্য 'স্টিললাইফ' এই সময়কার (*পুনশ্চ*-এর সময়কার) লেখায় চোখে পড়ে।'— শিশিরকুমার ঘোষ, *রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য* (প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৩৯৬) পৃ. ৪০

ঘ. 'পুনশ্চ কাব্যের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য জিনিস হল কয়েকটি narrative poems। প্রত্যেকটি একটি নিটোল গল্প এবং অধিকাংশই খাঁটি ট্রাজেডি। –হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

৫ 'কোপাই', পুনশ্চ, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৬ পূর্বোক্ত, 'ভূমিকা' অংশ দ্রষ্টব্য।

৭ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১২

৮ 'নাটক', পুনশ্চ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৯ 'প্রথম পূজা', পুনশ্চ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

১০ 'শুচি', পুনশ্চ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

১১ 'রঙরেজিনী', পুনশ্চ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

১২ 'প্রেমের সোনা', পুনশ্চ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

১৩ 'মুক্তি', পুনশ্চ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

১৪ 'স্নান-সমাপন', পুনশ্চ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

১৫ হেমন্তবালাকে লিখিত পত্র; পূর্বোক্ত, নবম খণ্ড, পৃ. ১৮০

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

১৭ ক. 'গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের অভিঘাত উল্লিখিত অস্পৃশ্যতা বিষয়ক কবিতাগুলিতে লক্ষণীয়।' —ড. ক্ষুদিরাম দাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪

খ. এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই 'অস্পৃশ্যতাবর্জন' আন্দোলনকে সমর্থন করে কবি পুনশ্চ কাব্যের 'মুক্তি' (১৪ই মাঘ ১৩৩৯), 'প্রেমের সোনা' (মাঘ ১৩৩৯), ও 'স্নান সমাপন' (১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৯) নামে তিনটি কবিতা লেখেন। এ ছাড়া 'শুচি', 'রঙরেজিনী,' 'প্রথম পূজা', 'শাপমোচন' প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও দেবতার বাস যে মানবহৃদয়ে এবং সর্বমানবের প্রতি প্রেমেই যে তার পূজা এই কথা ঘোষণা করলেন।— বাসন্তী চক্রবর্তী, *রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য* (ওরিএন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৩৮৭) পৃ. ২৬৬

১৮ আমি যে গ্রন্থগুলো পরীক্ষা করেছি তার মধ্যে রয়েছে :

ক. ড. ক্ষুদিরাম দাস, *রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়* (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, চতুর্থ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৮৪)

খ. শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ* (মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স, কলিকাতা, অখণ্ড পঞ্চম মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৮৮)

গ. সৈয়দ আলী আহসান, *রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা* (আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৭৪)

ঘ. ধীরানন্দ ঠাকুর, *রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা* (বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৬৯)

ঙ. প্রশান্তপাল, *রবিজীবনী*, প্রথম-ষষ্ঠ খণ্ড (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা)

চ. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, ১ম -৩য় খণ্ড (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৬৭)

ছ. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, *রবি-পরিক্রমা* (কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ঢাকা)

জ. প্রভাতকুমার গুপ্ত, *রবিচ্ছবি* (মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮২)

ঝ. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবিরশ্মি*, ১ম-২য় খণ্ড, (দে বুক সেন্টার, কলকাতা কলেজ স্ট্রিট সংস্করণ, ১৩৯৬)

ঞ. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-জীবনকথা* (আনন্দ সংস্করণ, ১৩৮৮)

ট. শ্রী প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্র-সরণী* (মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৪০০)

ঠ. শিশিরকুমার ঘোষ, *রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য* (প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৩৯৬)

ড. আবু সয়ীদ আইয়ুব, *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯২)

১৯ Dr. Rajendralal Mitra Ed., *The Sanskrit Budist Literature of Nepal* : 1882 মালিনী নাটকের উৎসও এ গ্রন্থেই নিহিত। এ-গ্রন্থেরই The Story of kusa [p.p. 142-44] অবলম্বনে রাজা রচিত হয়।

২০ রামচন্দ্র শুক্ল রচিত *হিন্দি সাহিত্য কা ইতিহাস* গ্রন্থে *ভক্তমাল* সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় :

'রামানন্দের শিষ্য অনন্তানন্দ দাস আর অনন্তানন্দের শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণদাস পয়হারী। কৃষ্ণদাস পয়হারীর শিষ্য ছিলেন অগ্রদাস। এই অগ্রদাসের শিষ্য ছিলেন ভক্তমালের প্রখ্যাত রচয়িতা নাভা দাস। নাভাদাস অগ্রদাসের শিষ্য, নিবেদিত ভক্ত ও সাধুসেবী ছিলেন। আনুমানিক সম্বত ১৬৫৭-এর দিকে

তিনি বর্তমান ছিলেন এবং গোস্বামী তুলসীদাসের মৃত্যুর পরও বহুবছর জীবিত ছিলেন। নাভাদাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভক্তমাল ১৬৪২ সম্বতের পরে রচিত এবং সম্বত ১৭৬৯-এ প্রিয়াদাস এর টীকা রচনা করেন। এ-গ্রন্থে ২০০ ভক্তের চমৎকারিত্বপূর্ণ চরিত্র ৩১৬টি ক্ষুদ্র কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। চরিত্রগুলো পূর্ণ জীবনবৃত্ত নয়—তাতে কেবল ভক্তি মহিমাসূচক বিষয়ের বর্ণনা আছে। ভক্তমাল-এর উদ্দেশ্য ছিল ভক্তির প্রতি জনতার আন্তরিকতা বৃদ্ধি ও প্রচার। এ উদ্দেশ্য বহুলাংশে সিদ্ধ হয়েছে। আজ উত্তর ভারতের গ্রামে গ্রামে সাধু বেশধারী পুরুষ ও পণ্ডিতদের যে বিপুল সম্মান প্রদান ও পূজা করা হয় তা ভক্তির চমৎকারিত্বপূর্ণ বৃত্তান্ত প্রচারের ফল। নাভাজীকে কেউ কেউ ডোম আবার কেউ কেউ ক্ষত্রিয়ও বলেছেন।
[হিন্দি থেকে প্রবন্ধকারের অনুবাদ; দ্র. পৃ. ১৪২-১৪৩]

২১ *কথা*-এর প্রথম প্রকাশে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন। উদ্ধৃত, গ্রন্থ পরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫১৭। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরেকটি মন্তব্য :
'এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধকাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টি প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ কথা ও কাহিনীর গল্পধারা উৎসের মত নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই-সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল।'– *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তবিংশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৩]

২২ 'পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থের ৩৬ সংখ্যক পত্রের অংশ বিশেষের সঙ্গে পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের 'সুন্দর' কবিতার অংশ বিশেষের তুলনা করা চলে। 'বাসা' কবিতার সঙ্গে প্রতিমা দেবীকে লেখা পত্র (পুনশ্চ গ্রন্থ পরিচয়ে উদ্ধৃত), 'বিচ্ছেদ' কবিতার সঙ্গে তুলনা করা চলে পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থের ৩৮ সংখ্যক পত্রটি, 'নাটক' কবিতার পাশাপাশি তিন বছর আগে শ্রীমতি নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা ২৩ শে শ্রাবণ ১৩৩৬ সালের পত্রটির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। শেষোক্ত পত্রটিকে 'নাটক' কবিতার প্রাকরূপ বলা চলে। উভয় রচনার সাদৃশ্য বিস্ময়কর।' —ড. সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ* (করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৪) পৃ. ২৯৮

২৩ বাসন্তী চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১

২৪ প্রশান্ত পাল, পূর্বোক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৬

২৫ 'ভক্তমাল' গ্রন্থে রামানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যদের নামের যে তালিকা দেয়া হয়েছে তা হল : অনন্তানন্দ, সুখানন্দ, সুর সুরানন্দ, ভাবানন্দ, পীপা, কবীর, সেন, ধনা, রইদাস, পদ্মাবতী ও সুরসুরবী। উদ্ধৃত : রামচন্দ্র শুক্ল, *হিন্দি সাহিত্য কা ইতিহাস* পৃ. ১১৮

২৬ রামচন্দ্র শুক্ল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২-৪৩। তথ্যসূত্রের ২০ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৭ 'রামানন্দজীর অন্যতম শিষ্য বলে রৈদাস বা রবিদাসকে মান্য করা হয়। যিনি জাতিতে চামার ছিলেন। তিনি কয়েকটি কবিতায় নিজেকে চামার বলে অভিহিত করেছেন। যেমন :

১. কহ রৈদাস খলাস চমারা।
২. ঐসী মেরী জাতি বিখ্যাত চমার।

জানা যায় যে ইনি কবিরের অনেক পরে রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ... কবির দাসের মত ইনিও ছিলেন কাশীবাসী। তাঁর একটি পদেও তার সাক্ষ্য মেলে।'– রামচন্দ্র শুক্ল, পুর্বোক্ত, পৃ. ৮১-৮২। [প্রবন্ধকারের অনুবাদ]

২৮ রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় থেকে যে কাল গণনার সূত্রপাত তাকেই বিক্রমাব্দ বা সম্বত বলা হয়। খ্রিস্টীয় সন থেকে ৫৭ বছর বিয়োগ করলে সম্বত পাওয়া যায়। –প্রবন্ধকার

২৯ রামচন্দ্র শুক্ল, পূর্বোক্ত (নাগরী প্রচারণী সভা, কাশী, সম্বত ২০২২) পৃ. ৩১৩-৩১৪ [প্রবন্ধকারের অনুবাদ]

৩০ Frank Ernest Keay, *A History of Hindi Literature* (Oxford University Press, Mysore City, 1920) p.-47

৩১ Suniti Kumar Chatterji, *Language and Literature of Modern India* (Bengal Publishers Private Limited, 1963) p. 128

৩৩ রামচন্দ্র শুক্ল *হিন্দি সাহিত্য কা ইতিহাস* গ্রন্থে মাধবানল-কামকন্দলা-এর রচয়িতা আলমের পরিচয় সূত্রে বলেছেন : 'ইনি আকবরের সময়কার একজন মুসলমান কবি যিনি হিজরি ৯৯১তে অর্থাৎ সম্বত ১৬৩৯-৪০ এ দোহা চৌপাইতে 'মাধবানল-কামকন্দলা' নামে প্রেমকাহিনীমূলক একটি কাব্য রচনা করেন।' পৃ. ১৯৩ [প্রবন্ধকারের অনুবাদ]

৩৪ শ্রীগণেশ প্রসাদ দ্বিবেদী, *হিন্দি প্রেমগাথাকাব্য সংগ্রহ* (হিন্দুস্তানী একাডেমী, উত্তর প্রদেশ, এলাহাবাদ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৬) পৃ. ১৭৫

৩৫ হিন্দিসাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি ৯০০ বছরের ইতিহাস বলে রামচন্দ্র শুক্ল মনে করেন এবং তিনি *হিন্দি সাহিত্য কা ইতিহাস* গ্রন্থটিতে ৯০০ বছরের

ইতিহাসকে চারটি কালপর্যায়ে বিভাজন করে আলোচনা করেছেন। কালপর্যায়ের বিভাজন নিম্নরূপ :

আদিকাল (বীরগাথাকাল, সম্বত ১০৫০-১৩৭৫)
পূর্বমধ্যকাল (ভক্তিকাল, সম্বত ১৩৭৫-১৭০০)
উত্তর মধ্যকাল (রীতিকাল, সম্বত ১৭০০-১৯০০)
আধুনিককাল (গদ্যকাল, সম্বত ১৯০০ বর্তমান অবধি)

আধুনিক কালকে শুক্ল আবার চারটি উত্থানে বিভাজন করেছেন :

পুরাতন ধারা : নতুন ধারা (১৯০০-১৯২৫)
নতুন ধারা প্রথম উত্থান (১৯২৫-১৯৫০)
নতুন ধারা দ্বিতীয় উত্থান (১৯৫০-১৯৭৫)
নতুন ধারা তৃতীয় উত্থান (১৯৭৫ থেকে বর্তমান)

৩৬ প্রাচীনসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে নিচের গ্রন্থগুলোয় :

ক. ড. হরনাথ পাল, *রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য* (এস. ব্যানার্জি এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৯০)

খ. ড. নরেশচন্দ্র জানা, *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ* (সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৮)

গ. বিমলকান্তি সমদ্দার, রবীন্দ্রনাথের-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কলিকাতা, ১৩৬৫)

ঘ. শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, *রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান* (বুকল্যান্ড লিমিটেড, কলিকাতা ১৩৬৮)

৩৭ 'রাজা রামমোহন রায় ধর্মমন্দিরে সংঘ উপাসনার প্রবর্তক; মন্দিরে উচ্চাঙ্গে তাল-মান-লয়-সংযোগে গানের প্রবর্তন তিনিই করেন। রাজার আরব্ধ কাজ দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা উজ্জীবিত হয়। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি স্বয়ং রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথ নানা রকম হিন্দিগান হইতে সুর আহরণ করিয়া বা হিন্দিগান ভাঙিয়া ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন।' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; *রবীন্দ্রজীবনী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৩৮ সীতাদেবী তাঁর স্মৃতিচারণায় শান্তি নিকেতনের একদিনের স্মৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকটি হিন্দি ও বাংলা গান গাহিলেন। সীতাদেবী, *পুণ্যস্মৃতি* (মৈত্রী, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭১) পৃ. ২৮

৩৯ হিন্দিগানের রূপ, রীতি ও সুরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বোধ কতটা পরিচ্ছন্ন ছিল তা বোঝা যাবে নিচের দুটি উদ্ধৃতি হতে :

ক. 'কথাকে সামান্য উপলক্ষ মাত্র করিয়া সুর শুনানই হিন্দি গানের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে। অতএব কাব্য রচনাই বাংলা গানের প্রধান উদ্দেশ্য, সুর সংযোগী গৌণ।' উদ্ধৃত, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পুর্বোক্ত, পৃ. ৩০৮

খ. 'হিন্দুস্তানি গানে কথা এতই যৎসামান্য যে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। ....অধিকাংশ স্থলেই হিন্দি গানের কথায় কোন ছন্দ থাকে না-সেই জন্যই ভালো হিন্দি গানের তালের গতিবৈচিত্র্য এমন অভাবিত পূর্ব ও সুন্দর।' পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০-২১১

৪০ ১২৯৩-এর বর্ষা সমাগমে রবীন্দ্রনাথ নাসিকে গিয়েছিলেন বেড়াতে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে তখন অস্থায়ী জেলা জজ। নাসিক থেকে তিনি সুরেন্দ্রনাথকে এ-কৌতুকপূর্ণ পত্র লেখেন। উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০-২১১

৪১ 'শান্তি নিকেতনের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জীবনে আবার বাধা পড়ে। ভরতপুরের হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন (১৯২৭); রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ নিয়ে ভরতপুরের মহারাজ কিষণ সিংহের দূত এল। চৈত্রমাসের দারুণ গরমেও কবি যেতে স্বীকৃত হলেন। ভরসা, বিশ্বভারতীর জন্য মহারাজের কাছ থেকে যদি কিছু পাওয়া যায়।' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-জীবনকথা* (প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮৮) পৃ. ৭৯

৪২ প্রশান্ত পাল, পূর্বোক্ত, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৯৪, পৃ. ১৭৬

৪৩ রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে যে পত্র লেখেন তা নিম্নরূপ :

'বোলপুরে আমি কিছুদিন হইতে একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দিতেছি। আপনার সম্বন্ধে আমি যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে এখানকার কর্মে আপনাকে আবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই কার্য্যে যোগদান করেন তবে আমি সহায়বান হইব এবং যাহাতে আপনার আর্থিক ক্ষতি না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিব। আমার বিশ্বাস সেখানকার কর্মে আপনি আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।' কিন্তু ক্ষিতিমোহন প্রথমে উচ্চ রাজপদ ত্যাগ করে

অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে বরণ করতে আগ্রহী হননি। রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ তাকে লেখেন :

'যে লক্ষ্য ধরিয়া আজ ছয় বৎসরকাল এই বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠাদান করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত সহায়ের একান্ত আবশ্যক। এই কারণেই আপনার সন্ধান পাইয়া, আপনার অসম্মতি সত্ত্বেও পুর্নর্ব্বার আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। এই বিদ্যালয়ে আপনি নিজের শক্তিকে সর্ব্বথা প্রয়োগ করিবার সুযোগ পাইবেন—ইহাতে যথার্থই আপনি সৃষ্টি করিয়া তুলিবার আনন্দ পাইবেন এবং ঈশ্বরের প্রসাদে এই সৃষ্টির দ্বারা দেশের একটি স্থায়ী মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এই কাজে আপনাদের সহায়তা আমি কেবলমাত্র প্রার্থনা করিব না-দাবী করিব।' এ চিঠির পর ক্ষিতিমোহন সেন আংশিক সম্মতি প্রদান করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুনর্বার লেখেন :

'জানি না, কি কারণে আপনার সহিত পরিচয় না থাকিলেও আপনাকেই আমার চিত্ত এই কাজে বরণ করিয়া লইতেছে। ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন তবে নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত সঙ্কোচ ও চিন্তা দূর করিয়া দিয়া ধরা দিবেন। —আপনি না আসিয়া কোন মতেই থাকিতে পারিবেন না—আপনার পর্ব্বত হইতে আপনি নদীর মত এখানে ছুটিয়া আসিবেন। আমার নিজের কাজ হইলে আপনাকে এমন করিয়া ডাকিতে পারিতাম না। আমি যাহাকে মনে রাখিয়া ডাকিতেছি তাহার কাছে নিষ্কৃতি পাইবেন না।'

অতঃপর ক্ষিতিমোহন সেন ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে যোগ দেন। উদ্ধৃত: *রবিজীবনী*, পূর্বোক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪০৮

৪৪ প্রশান্ত পাল, পূর্বোক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫২

৪৫ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

৪৬ প্রশান্ত পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৩

৪৭ ড. রামেশ্বর মিশ্র, *মধ্যযুগীয় হিন্দি সন্ত সাহিত্য ঔর রবীন্দ্রনাথ* (বারানসী, ১৯৮৯) পৃ. ৮৪-৮৭

৪৮ কবীরের দোহাগুলোর ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিতর্কমূলক আলোচনা রয়েছে প্রশান্ত পালের *রবিজীবনী* ষষ্ঠ খণ্ডে, পৃ. ৪১৬

৪৯ প্রশান্তপাল রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত ঐ বইটি পরীক্ষা করে এ মন্তব্যে করেছেন। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬